প্রথম আলো

তারিখ 07 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কাজ করেন না'!

শিক্ষা ও শিক্ষক

কাবেরী গায়েন

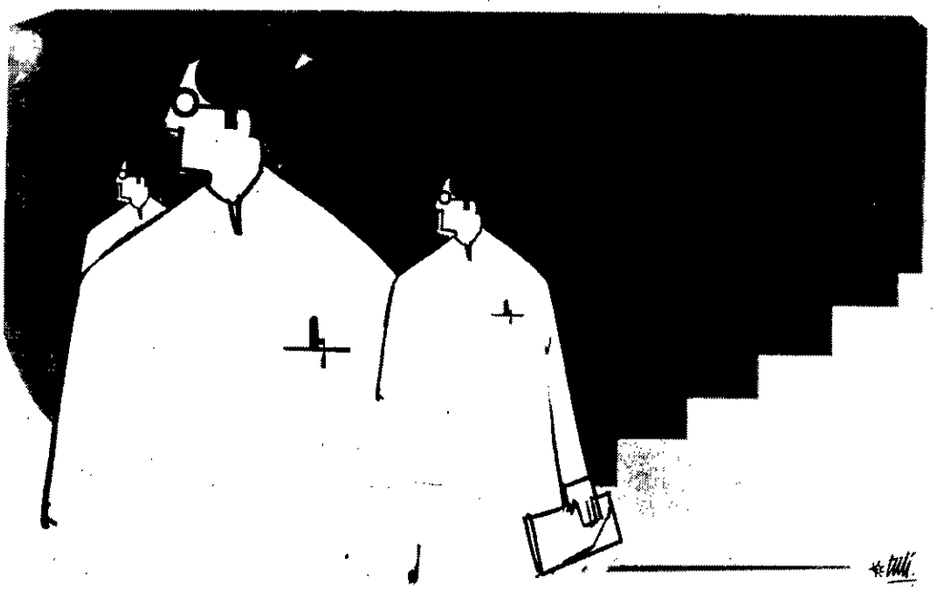

দেশের শিক্ষক সম্প্রদায়, বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা খুব খারাপ। তাঁরা ক্লাস নেন না, পড়ান না, নিজেরাও পড়েন না। ছাত্রদের শেখাবেন কী? তাঁদের কোনো গবেষণা নেই। পৃথিবীর ১০০টি কিংবা ১০০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। কী আরামের চাকরি!

সপ্তাহে চার-পাঁচটা মাত্র ক্লাস! বাংলাদেশে খুব কম নাগরিক আছেন, যিনি এসব জানেন না এবং বলেন না। ক্ষমতার উঁচু পর্যায় থেকে শুরু করে যিনি কোনো দিন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ অবধি যাননি, তিনিও এসব কথা নিশ্চিতভাবে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন। মাঝেমধ্যেই আশ্চর্য হয়ে ভাবি, সত্যি তো, আমরা তো কিছুই করি না, তবু কেন আমাদের বেতন দেওয়া হয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নামের এমন এক 'সম্মানজনক' পদে আমরা আছি, এই কি যথেষ্ট নয়? রাষ্ট্রের উচিত আমাদের বেতনকাঠামো থেকে আরও কয়েক ধাপ নামিয়ে সম্মানিত করা। চাইলে রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে অবৈতনিকও করে দিতে পারে।

মুশকিল হলো, যে শিক্ষকসমাজের বিদ্যা-বুদ্ধি-কমিটমেন্ট কিছু নেই, তাদের 'সম্মানিত' করার জন্য রাষ্ট্রের কতই-না আয়োজন! এত সম্মানিত সম্প্রদায় কেন সামান্য বেতন-ভাতা, বেতনকাঠামো নিয়ে মাথা ঘামাবে? কিছু কিছু সম্মানজনক পদ আছে, যেসব পদ টাকাকড়ি দিয়ে মাপা ঠিক নয়। আমাদের সমাজে যেমন মায়ের পদ। সন্তানের বেহেশত মায়ের পায়ের নিচে। মায়েদের সম্মান এত বেশি বলেই না সম্পত্তির উত্তরাধিকার বা সন্তানের অভিভাবকত্বে অধিকারের মতো সামান্য বিষয় দিয়ে তাঁদের সম্মান মাপা কাঙ্ক্ষিত নয়। মাপা হয়ও না।

মুশকিল আরও আছে। যে শিক্ষকেরা কোনো দিন কিছু শেখালেন না, যাঁদের নাকি শ্রেণিকক্ষে কোনো দিন পাওয়াই গেল না, তাঁদের ছাত্রছাত্রীরা যখনই সরকারি কর্মকর্তা হলেন, তাঁরা এতই শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে সক্ষম হলেন যে তাঁদের বেতনকাঠামো, পদমর্যাদা তো বাড়ানো হলোই, একই সঙ্গে সচিবের ওপরে আরও দুটি পদ সৃষ্টি করে তাঁদের পুরস্কৃত করা হলো। এই হিসাবটা অবশ্য আমি মেলাতে পারি না। স্কুল থেকে শুরু করে কোনো পর্যায়ের শিক্ষকই যখন কিছু শেখানোর মতো যোগ্যও নন, কিছু শেখালেনও না কোনো দিন, তাঁদের ছাত্রছাত্রীরা সরকারি কর্মকর্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন 'যন্তর মন্তর' ঘরে ঢুকে এমন পুরস্কৃত হওয়ার মতো শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন, সেটা জানার আগ্রহ বহুদিনের। কিন্তু যাঁরা আমাদের অবহিত করতে পারেন, তাঁরা সেই কষ্টটি করছেন না।

দুই.

আমাদের দুর্বলতাগুলো স্বীকার করার ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি নেই। আমাদের আরও যোগ্য একাডেমিক হয়ে ওঠার অবকাশ আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষকরাজনীতির অতিরিক্তপনা আছে, গবেষণার ঘাটতি আছে, বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারছে না, বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকায় নাম তুলতে পারছে না। কাজেই ন্যায্য তিরস্কার মাথা পেতে নিয়েই বিনীত প্রশ্ন, আমাদের কোন সেক্টর বিশ্বের সেরা তালিকায় জায়গা করে নিতে পেরেছে? আমরা কম নিশ্চিত, আমাদের জনপ্রশাসনের কর্মকর্তারা, যাঁদের রাষ্ট্র পদমর্যাদা বাড়িয়ে পুরস্কৃত করছে, তাঁরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জনপ্রশাসনের প্রথম দিকে জায়গা করে নিতে পেরেছেন? এ দেশের প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি, সাংবাদিকতা, আইন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, গণমাধ্যম, ব্যবসা—কোন সেক্টর বাংলাদেশকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তালিকায় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে? এক ক্রিকেট ছাড়া আমাদের বিশ্বমানের সাফল্য মনে করতে পারছি না।

শিক্ষকেরা কিছুই পড়ালেন না, অথচ এ দেশের শিক্ষার্থীরা পাস করে বড় বড় ক্ষেত্রে সাফল্য দেখালেন। প্রতিবছর আমাদের মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিদেশে গিয়ে দিব্যি ভালো ফল করে বের হচ্ছেন। শিক্ষকেরা রাজনীতি করেন, দেখাই যায়। মজার বিষয় হলো, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চলে ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী, যেখানে শিক্ষকদের রাজনীতি করতে বাধা নেই। অথচ জনপ্রশাসনে যাঁরা চাকরি করেন, তাঁরা কোনো দলীয় রাজনীতি করবেন না—এমন শপথ নিয়েই ঢোকেন। তাহলে রাজনৈতিক ক্ষমতাবদলের সঙ্গে সঙ্গে কেন প্রশাসনে এত এত কর্মকর্তা ওএসডি হন এবং বিপরীত রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এলে তাঁরাই দাপটের কর্মকর্তা হন? দেশের কোন পেশাজীবীদের নির্বাচন হয় না দলীয় রাজনীতির বিভাজনে? এসব প্রশ্ন তোলার ভেতর দিয়ে আমি নিশ্চয়ই দাবি করছি না, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাজনীতির মধ্য দিয়ে যে দলীয়করণ হচ্ছে, তা ভালো। বরং বলছি, কোনো পেশাই এই দলীয়করণের বাইরে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান কিংবা স্কুল-কলেজের শিক্ষকেরা প্রাইভেট টিউশনি করেন মর্মে নিন্দা করতে শুনি, এমনকি আমার চিকিৎসক বন্ধুদের। ক্লিনিক ফেঁদে বসা চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের। কোনো চিকিৎসক এই মানবাধিকারবিরোধী চিকিৎসা ব্যবসার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন বলে জানা নেই। গণমাধ্যমও বেশ নিশ্চুপ এ বিষয়ে। অথচ শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই আমরা ক্রমাগত লিখছি, প্রতিবাদ করছি কোচিং ব্যবসার বিরুদ্ধে, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে। আর বিশ্বের সঙ্গে গবেষণায় আমাদের পিছিয়ে থাকার কথা যখন উঠলই, তখন বিনয়ের সঙ্গে বলি, গবেষণার জন্য বিনিয়োগ করতে হয়। ওই যে শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে তালিকা আওড়ানো হয়, সেই তালিকাভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পেছনে রাষ্ট্রের বিনিয়োগ সম্পর্কে কোনো খোঁজ কি নিয়েছেন আমাদের সাংবাদিকেরা কখনো? তারপর মিলিয়ে দেখেছেন গবেষণায় কিংবা সার্বিকভাবে শিক্ষায় আমাদের বিনিয়োগ কত? তুলনাটা এরপর করলে ভালো হতো।

তিন.

শিক্ষকদের সম্পর্কে এসব মন্তব্য দেখে মনে হয়, এত ক্ষয়ের পরেও কোথাও বুঝি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিমেয় সুপ্ত শক্তি আছে। যে শক্তিকে আসলে ক্ষমতাবানেরা ভয় পান। তাই কখনো স্টাফ হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করতে চান, কখনো নয়টা-পাঁচটা অফিস করতে বলেন। যাঁরা মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোনো কাজ নেই, তাঁদের জন্য বিনীতভাবে শুধু বলার আছে, কোন যুগে শিক্ষকদের ক্লাস নিতে হতো না, জানি না। কিন্তু এখন আমরা চলি সেমিস্টার পদ্ধতিতে। বছরে দুটি সেমিস্টার। চার মাস ক্লাস হয় প্রতি সেমিস্টারে, তারপর ফাইনাল, রেজাল্ট। আমার বিভাগে প্রতি ক্লাসে ৭০ জনের মতো শিক্ষার্থী। এই চার মাসে ক্লাসের মধ্যেই নিতে হয় একটি মিডটার্ম (কখনো-বা দুটি), একটি গ্রুপ প্রেজেন্টেশন এবং মনোগ্রাফ। অনুপস্থিত ও অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের ফের পরীক্ষা নেওয়ার বিষয় তো রয়েছেই। ৭০টি মনোগ্রাফের বিষয় ঠিক করে দেওয়া, কয়েকবার করে আলাপ করা, জমা দেওয়া হলে পরে নম্বর দেওয়া। মিডটার্মের খাতা দেখা, নম্বর দেওয়া। এসব করতে হয় সেমিস্টার ফাইনালের আগেই, নম্বর টাঙিয়ে দিতে হয়।

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এসব করার জন্য কোনো গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট নেই। যে শিক্ষক প্রতি সেমিস্টারে অন্তত দুটি কোর্স পড়ান, সেমিস্টার চলাকালে তাঁর আসলেই কি কোনো সময় আছে নিজের জন্য? মাস্টার্সের রিসার্চ মেথডলজি ক্লাস চলার সময় আমি স্তূপ করা খাতার বহর নিয়ে বাসায় যাই, সারা রাত জেগে পড়তে থাকি, ফের ডিপার্টমেন্টে আসি। দফায় দফায় আলোচনা চলে। আধা ঘণ্টার বিরতিতে ছয় ঘণ্টা ক্লাসও নিতে হয় শেষ দিকে। সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে এই শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০০-এর বেশি। তাঁরা কীভাবে সামলান, আমি কল্পনাও করতে পারি না। আমি শুধু দেখি, সেমিস্টার চলাকালে ক্লাসের বাইরে আমি খাতা দেখছি, নয়তো রিসার্চ সম্ভাবনা ঠিক করছি, নয়তো ক্লাসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। রয়েছে থিসিস তত্ত্বাবধান, পরীক্ষা কমিটির দায়িত্ব পালন, সিলেবাস কমিটিতে কাজ, বিভাগের নানা ধরনের কাজে সংশ্লিষ্ট থাকা। আর কেউ যদি এরই মধ্যে রিসার্চ অ্যাকটিভ থাকতে চান, তাহলে তো কথাই নেই। যাঁরা রিসার্চ অ্যাকটিভ থাকতে পারেন না, তাঁদেরও যে মানেরই হোক কিছু প্রকাশনা করতে হয় এরই মধ্যে। বিজ্ঞান অনুষদগুলোর শিক্ষকদের দেখি, সাড়ে সাতটার বাসে আসেন আর বিকেল পাঁচটার বাসে বাসায় ফেরেন। কাজেই যাঁরা শিক্ষকের কর্মহীন জীবন দেখেন, তাঁদের প্রতি অনুরোধ, সেই ম্যাজিকটা যদি একটু দেখিয়ে যেতেন! বরং সেমিস্টার রুটিন যেভাবে সাজানো, তাতে মনে হয়, এ সময় কোনো শিক্ষকের মা মারা যেতে পারবেন না, কারও এক দিন জ্বর হতে পারবে না, এক দিন বৃষ্টি হতে পারবে না।

চার.

ফিরে যাই মূল প্রসঙ্গে। শিক্ষকদের কাজ কম, এটি একটি মিথ। এই মিথের নির্মাণ সম্ভব হয়েছে শিক্ষকদের তরফ থেকে প্রতিবাদ না আসার কারণে এবং শিক্ষার্থীদেরও শিক্ষকদের কাজ সম্পর্কে ধারণা না থাকার জন্য। অন্য সব পেশায় নয়টা-পাঁচটার পরে ঘরে ফিরে টেলিভিশন দেখা যায়, সেমিস্টার পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে তাও সম্ভব নয়। দলীয় রাজনীতিতে সব পেশার মানুষই বিভক্ত। দেশের কোনো সেক্টরই বিশ্বের সেরা তালিকায় জায়গা করে নেই। তুলনা তো আমাদের সাপেক্ষে হতে হবে। এই সার্বিক পরিস্থিতিতে এখনো, সবচেয়ে ভালো ফল করা ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতাতেই আসেন। তবে কেন বেতন স্কেলে বৈষম্য? কেন মানহানিকর বক্তব্য?

শিক্ষকদের প্রতি এই অসম্মান চলতে থাকলে মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতায় আর পাওয়া যাবে না। অথচ এখনই ছিল শ্রেষ্ঠ সময় শিক্ষায় বিনিয়োগ সর্বোচ্চ করার, শিক্ষকদের মর্যাদা সর্বোচ্চ করার।

● **কাবেরী গায়েন : অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**